تفسير سورة الفاتحة

لشيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

ترجمة: محمد رقيب الدين أحمد حسين

সূরা ফাতিহার তাফসীর

মূল আরবীঃ

শায়খুল ইসলাম

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব (রাহেমাহুল্লাহ)

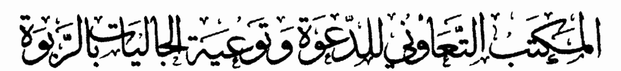
ভাষান্তরেঃ

মুহাম্মদ রকীবুদ্দীন হুসাইন

১৪১৬ হিঃ ১৯৯৬ ইং

কম্পোজিং,সম্পাদনা ও প্রকাশনাঃ

রাবওয়া ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার, রিয়াদ



ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'য়ালার কালামে পাক কুরআন শরীফের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ হলো এই সূরা ফাতেহা। এই সূরা সমগ্র কুরআন শরীফের সার-সংক্ষেপ। পুর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এটিই প্রথম নাযিল হয় এবং কুরআন শরীফের প্রথমেই এর স্থান নির্ধারণ করা হয়। এজন্য এর নাম সূরা ফাতেহা (প্রারম্ভিক সূরা) রাখা হয়েছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন: ((যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছিঃ সূরা ফাতেহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর প্রভৃতি কোন আসমানী কিতাবে তো নেই, এমনকি, পবিত্র কুরআনেও এর দ্বিতীয় নেই।)) রাসূল ﷺ আরো বলেন: ((সূরা ফাতেহা সব রোগের ঔষধ বিশেষ।)) অপর আরেকটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন: ((যে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।)) [বুখারী ও মুসলিম]

সূরা ফাতেহা মূলতঃ একটি প্রার্থনা বিশেষ, যা আল্লাহ পাক মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অবশিষ্ট কুরআন হলো তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব, যার মধ্যে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব (রাহেমাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত সূরা ফাতেহার এই তাফসীরখানা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি এর মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দার মোনাজাত ও এবাদতে তওহীদ এই বিষয় দুটি অত্যন্ত চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালে রচিত তাফসীরগুলোতে সাধারণতঃ বিষয় দুটো এমন গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বাংলাভাষী ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদে বাংলা ভাষায় সূরা

ফাতেহার এই তাফসীরখানা অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যারা আরবী ভাষায় অজ্ঞ বা অদক্ষ তারা যাতে কমপক্ষে ১৭ বার দৈনিক নামাযে পঠিতব্য এই সূরাটি স্থিরচিত্তে পড়েন এবং কি বিষয়ে আল্লাহর সাথে মোনাজাত করছেন তার মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন। আল্লাহ্ পাকের দরবারে ভুল-ক্রটির ক্ষমা চাই এবং তাঁর পবিত্র কালাম সম্পর্কিত এই খেদমতটুকু কবুল করার প্রার্থনা জানাই।

উল্লেখ্য যে, আমি এই অনুবাদের কাজে রিয়াদস্থ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কুরআন শিক্ষা বিভাগের প্রধান ডঃ ফাহ্‌দ বিন আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আল়-রুমী কর্তৃক প্রতিপাদিত 'তাফসীরে ফাতেহা'র কপিটি অনুসরণ করেছি।

আল্লাহ্ পাকই আমাদের তওফীকদাতা।

অনুবাদক

এক নজরে
শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব তামীমী (রাহেমাহুল্লাহ)

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব (রাহেমাহুল্লাহ) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর এক অন্যতম ধর্ম সংস্কারক ছিলেন। তিনি ১১১৫ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে সউদী আরবের নাজ্দ এলাকায় আল-উয়াইনা নামক শহরে এক ধর্মপ্রাণ ও সম্মানিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। আল-উয়াইনা শহরটি সউদী আরবের বর্তমান রাজধানী রিয়াদের প্রায় ৭০ কিলো মিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের পিতা ছিলেন আল-উয়াইনার একজন বিচারপতি। বংশগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তামীম গোত্রীয়। হাম্বালী মযহাবের তৎকালীন একজন খ্যাতনামা আলেম হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব (রাহেমাহুল্লাহ) বার বৎসর বয়সে পদার্পন করার আগেই পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করে ফেলেন। এরপর তাঁর পিতাসহ স্থানীয় উলামাদের কাছে ফিক্হ, তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে অধ্যয়ন শুরু করেন। তারপর তিনি আরো অধিক বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন। প্রথমে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকার্রামা গমন করেন। সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারতে যান, এবং সেখানকার আলেমগণের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। মদীনায় থাকা কালীন তিনি রাসূল ﷺ এর রওযা মুবারক ও বাকী'য়ে গারকাদ (জান্নাতুল বাকী')কে কেন্দ্র করে কিছু লোকের বিদ'আত ও অবৈধ ক্রিয়া-কর্মের প্রতি তাঁর তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এবং তাদের এজাতীয় কাজ থেকে

বিরত থাকার জন্য নছিহত করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় এলাকা নাজ্‌দে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পর তিনি বাসরা সফরে বের হন। সেখানে বিদ'আত ও কুসংস্কার যা দেখতে পেলেন তা ছিল মদীনা মুনাওয়ারায় সংঘটিত কুসংস্কারের চেয়েও অধিক ও মারাত্মক। সেখানে ছিল সজ্জিত কবর সমূহ, লোক এগুলো তওয়াফ করত এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মসেহ (স্পর্শ) করত। এতদ্ব্যতীত ছিল আরো অনেক বিদ'আত ও কুসংস্কার যা দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং সেখানকার লোকদের এজাতীয় কাজ করতে নিষেধ করেন।

কিন্তু শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের বিদ'আত বিরোধী এই ভূমিকা সেখানকার লোক গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তাঁকে বাসরা থেকে বের করে দিল। শূন্যপদ, শূন্যহাত ও নগ্ন মস্তকে অসহায় অবস্থায় গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্রের মাঝে তিনি বাসরা থেকে বের হয়ে পড়েন। পথিমধ্যে পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছিল। আল্লাহর রহমতে জুবায়র বাসীরা তাঁকে আশ্রয় দিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে।

কথিত আছে যে, তিনি বাসরা ত্যাগের পর সিরিয়া অভিমুখে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য সেদিকে না গিয়ে আল-আহসার পথে নাজ্‌দ প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব হুরাইমালা নামক শহরে পিতার সাথে অবস্থান শুরু করেন। ইতিপূর্বে তাঁর পিতা আল-উয়াইনা থেকে হুরাইমালায় বদলি হয়ে যান। হিজরী ১১৫৩ সনে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি একাই দা'ওয়াত ও সংস্কারের কাজে সমূহ বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি তওহীদের উপর বই লিখা শুরু করেন। বিভিন্ন দিক থেকে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর সুনাম ও

দা'ওয়াতের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর হুরাইমালা বাসীরা তাঁর দা'ওয়াত ও সংস্কার মূলক কাজে একমত হতে না পেরে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি আল-উয়াইনায় উপস্থিত হন। সেখানকার শাসক তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সমাধির উপর তৈরী অনেক গম্বুজ ও নানাবিধ কুসংস্কারের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করেন এবং খাঁটি তওহীদের বার্তা লোক সমাজে প্রচার করতে থাকেন।

এখানেও শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব হিংসুক ও সংস্কার বিরোধী লোকদের ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাননি। অবশেষে, এখান থেকেও তাঁকে বিদায় নিতে হলো। অতঃপর তিনি রিয়াদের নিকটবর্তী দিরইয়া নামক শহরে উপনীত হন। সেখানকার শাসক আমীর মুহাম্মদ বিন সঊদ তাঁকে স্বাগত জানান এবং দ্বীনে হকের প্রচার এবং সুন্নাতে রাসূলকে জীবন্ত ও বিদ'আত নির্মূল অভিযানে সব রকমের সাহায্য-সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

এমনিভাবে দিরইয়া শহরকে কেন্দ্র করে শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব দ্বীনের দা'ওয়াত পুনরোদ্দমে শুরু করেন। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এলাকার শাসক, গোত্রীয় প্রধান ও উলামাবর্গের প্রতি দা'ওয়াত ও সংস্কারের কাজে তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য পত্র লিখে আহ্বান জানান। ফলে অনেকেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংস্কার ও দা'ওয়াতের কাজে ঝাপিয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দিরইয়া আগমনের পর আমীর মুহাম্মদ বিন সঊদ ও শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের মধ্যে হিজরী ১১৫৭ সনে দা'ওয়াত ও সংস্কারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক

সহযোগিতা ও সাহায্যের যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা 'দিরইয়া চুক্তি' নামে সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই চুক্তিটি সংস্কার মূলক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণে গোটা আরব উপদ্বীপ তথা আধুনিক মুসলিম বিশ্বে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। নির্মল তওহীদ ও শরীয়তের বিধি-বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তনের এই আহ্বান নাজ্‌দ এলাকায় এক ধর্মীয় পুনঃজাগরণের প্রবাহ সৃষ্টি করে। যথাযথভাবে নামায প্রতিষ্ঠা হয়, বিদ'আত, কুসংস্কার, শিরক ও অবৈধ কর্মাদি বিলুপ্ত হয় এবং দিকে দিকে খাঁটি তওহীদের বাণী ছড়িয়ে পড়ে।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্‌হাব ইত্যবসরে এবাদত, তা'লীম ও ওয়াজ নছিহতে মনোনিবেশ করেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে তওহীদ, ঈমান, ফাযাইলে ইসলাম, কাশফুশ শুবুহাত ও মাসাইলে জাহিলিয়াহ ছিল অন্যতম।

প্রকৃত তওহীদের বার্তাবাহক, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দুর্জয় সেনা ও শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের আপোষহীন সংগ্রামী এই মহান ধর্মীয় নেতা শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্‌হাব ১২০৬ হিজরী সনে দিরইয়ায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ পাক তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم

(পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)

প্রিয় পাঠক! (আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন, আপনাকে তাঁর হেফাজতের আওতায় পরিবেষ্টিত রাখুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি আপনার অভিভাকত্ব গ্রহণ করুন।) জেনে রাখুন, নামাযের প্রাণ অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য হল এর মধ্যে অন্তরকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি নিবিষ্ট রাখা। সুতরাং যদি কোন নামায উপস্থিত ও নিবিষ্ট অন্তর ব্যতিরেকে আদায় করা হয় তাহলে তা হবে প্রাণহীন দেহের মত অসার। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (٤-٥) سورة الماعون

অর্থ: "সেই সব মুছল্লীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন।" [সূরা আল-মাউন: ৪-৫]

এখানে السهو (উদাসীনতা) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়: নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ে উদাসীনতা, নামাযের মধ্যে পালনীয় ওয়াজিব সম্পর্কে উদাসীনতা এবং নামাযে আল্লাহর প্রতি অন্তর হাযির ও নিবিষ্টতা করতে উদাসীনতা। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রতিপাদন করে। উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন:

''تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً،،

অর্থঃ ((এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, সে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, যখনই সূর্য অস্ত যাওয়ার সন্ধিক্ষণে শয়তানের শিঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে, তখন সে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি করে চার রাক'আত নামায এমন ভাবে পড়ে নেয় যার মধ্যে সে আল্লাহর যিকর অল্পই করে থাকে।))[1]

এখানে (সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে) দ্বারা সময়ের অপচয়, (তড়িঘড়ি করে চার রাক'আত নামায পড়া) দ্বারা নামাযের রুকনগুলো সঠিক ভাবে পালন না করা এবং (সে আল্লাহর যিকর অল্পই করে থাকে) দ্বারা নিবিষ্ট ও স্থিরচিত্ত না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথা অনুধাবনের পর পাঠক মহোদয় নামাযের অন্তর্ভুক্ত এক বিশেষ রুকন ও এবাদত উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন, আর তা হলো 'সূরা ফাতেহা' পড়া, যাতে আল্লাহ পাক আপনার নামায বহুগুণ ছওয়াব বিশিষ্ট পাপ মোচনকারী মকবুল নামাযের মধ্যে গণ্য করে নেন।

সূরা ফাতেহা সঠিক ভাবে অনুধাবনের পথ উন্মুক্ত করার এক সর্বোত্তম সহায়ক হল সহীহ মুসলিমে সংকলিত হযরত আবূ হুরায়রা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদীছ। তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ ((আমি ছালাত (সূরা ফাতেহা) আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি, আর, আর আমার বান্দাহ যা চাইবে তা-ই তাকে দেওয়া হবে।)) বান্দাহ যখন বলেঃ

﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

---

[1]সহীহ মুসলিম (আল-মাসাজিদ), আবু-দাউদ (আছ-ছালাত), তিরমিযী (মাওয়াকীতে ছালাত), নাসায়ী (মাওয়াকীতে ছালাত) ও মুসনাদে আহমদ।

অর্থ: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।” আল্লাহ তা'য়ালা তখন বলেন: ((আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো।)) যখন বান্দাহ বলে:

﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾

অর্থ: “পরম করুণাময় অতি দয়ালু।” তখন আল্লাহ বলেন: ((আমার বান্দাহ আমার গুণগান করলো।)) যখন বান্দাহ বলে:

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

অর্থ: “প্রতিফল দিবসের মালিক।” তখন আল্লাহ বলেন: ((আমার বান্দাহ আমার মর্যাদা বর্ণনা করলো।)) যখন বান্দাহ বলে:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

অর্থ: “আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।” তখন আল্লাহ বলেন: ((এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চাইবে।)) অতঃপর যখন বান্দাহ বলে:

﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ

وَلاَ الضَّالِّينَ﴾

অর্থ: “আমাদের সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের তুমি নিয়ামত দিয়েছ, তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট।” তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: ((এসব তো আমার বান্দার জন্য

এবং আমার বান্দাহ যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে।))[1] (হাদীছ সমাপ্ত)

বান্দাহ যখন একথা চিন্তা করবে এবং জানতে পারবে যে, সূরা ফাতেহা দু'ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগ إِيَّاكَ نَعْبُدُ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য, আর, দ্বিতীয় ভাগ সূরার শেষ পর্যন্ত যা বলে বান্দাহ দু'আ করে, তার নিজের জন্য এবং একথাও যখন সে চিন্তা করবে যে যিনি এই দু'আ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি হলেন কল্যাণময় মহান আল্লাহ। তিনি তাকে এই দু'আ পড়ার এবং প্রতি রাক'আতে তা পুনর্ব্যক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক দয়া ও করুণা বশতঃ এই দু'আ কবুলের নিশ্চয়তাও দিয়েছেন যদি বান্দাহ নিষ্ঠা ও উপস্থিত চিত্তে তা করে থাকে, তখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অধিকাংশ লোক অবহেলা ও উদাসীনতার ফলে নামাযে নিহিত কি যে মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে থাকে!

কবিতা:-

قد هيؤك لأمر لو فطنت له

فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

وأنت في غفلة عما خلقت له

وأنت في ثقة من وثبة الأجل

فزك نفسك مما قد يدنسها

واختر لها ما ترى من خالص العمل

أأنت في سكرة أم أنت منتبها

---

[1]সহীহ মুসলিম (আছ-ছালাত), আবু-দাউদ (আছ-ছালাত), তিরমিযী (তাফসীরে কুরআন) এবং নাসায়ী (আল-ইফতেতাহ)।

أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل

অর্থ: 'অসৎ লোকেরা তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফাঁদ পেতেছে, হায়! তুমি যদি তা আঁচ করে নিতে। অতএব, ঐসব অবাঞ্ছিত লোকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখ।'

'তুমি তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন এবং অহেতুক বিশ্বাস কর যে, মৃত্যু তোমাকে সহজে পাকড়াও করবে না।'

'যা তোমার আত্মাকে কলুষিত করতে পারে তা থেকে তুমি উহা পবিত্র রাখ এবং এর মঙ্গলের জন্য খালেছ নেক আমল অর্জন কর।'

'তুমি কি বিভোর না সতর্ক? নিরাপদ তোমায় প্রবঞ্চনা দিল, না অভিলাষ তোমাকে অমনোযোগী করে ফেলেছে?'

প্রিয় পাঠক! আমি এই মহান সূরার কিছু মর্মার্থ এখানে পেশ করছি। আশা করি, আপনি উপস্থিত চিত্তে নামায পড়বেন এবং মুখে যা ব্যক্ত করেন তা যেন আপনার অন্তর উপলব্ধি করে থাকে। কেননা, মুখে যা উচ্চারিত হয় তা যদি অন্তর বিশ্বাস না করে তাহলে এটা কোন নেক কাজ হিসেবে পরিগণিত হয় না। যেমন আল্লাহ পাক বলেন:

﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (١١) سورة الفتح

অর্থ: "তারা মুখে মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই।" [সূরা আল-ফাত্হ: ১১]

এখন সংক্ষিপ্তাকারে প্রথমে 'ইস্তেআযা' (আঊযু বিল্লাহ) এবং পরে 'বাসমালাহ' (বিসমিল্লাহ) এর অর্থগত বর্ণনা দিয়ে সূরা ফাতেহার বর্ণনা শুরু করছি:

'ইস্তেআযা':-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: ((আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে।))

এর অর্থ হলো: আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাঁর দরবারে নিরাপত্তা কামনা করি এই মানব শত্রু বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যাতে, সে আমার ধর্মীয় বা পার্থিব কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে, আমি যে বিষয়ে আদিষ্ট তা সম্পাদনে সে যেন আমাকে বাধা দিতে না পারে এবং যা নিষিদ্ধ তার প্রতি সে যেন আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। কেননা, যখন বান্দাহ নামায, কুরআন তেলাওয়াত বা অন্য কোন কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে, তখন এই শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠে। আর, তা এই জন্য যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ব্যতিরেকে আপনার পক্ষে শয়তানকে দূর করার কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ﴾ (٢٧) سورة الأعراف

অর্থ: "সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদের এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না।" [সূরা আল-আ'রাফ: ২৭]

সুতরাং আপনি যখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরবেন তখন তা নামাযের মধ্যে আপনার আন্তরিক উপস্থিতি বা একাগ্রচিত্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, আপনি এই বাক্যের মর্মার্থ ভালভাবে অনুধাবন করবেন এবং অধিকাংশ লোকের ন্যায় শুধু মুখে মুখে তা ব্যক্ত করে ক্ষান্ত হবেন না।

'বাসমালাহ'

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহর নামে) এর অর্থ হলো: আমি একাজে-পড়া, দু'আ বা অন্য কিছুই হোক নিয়োজিত হলাম আল্লাহর নামে, আমার শক্তি সামর্থের বলে নয়, বরং একাজ সম্পাদন করতে যাচ্ছি আল্লাহ পাকের সাহায্যে, তাঁর কল্যাণময় ও মহান নামের বরকত কামনা করে। ধর্মীয় ও পার্থিব প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে এই 'বাসমালাহ' পড়তে হয়। সুতরাং যখন আপনি মনে করবেন যে, আপনার এই পড়া কেবল আল্লাহরই সাহায্য নিয়ে শরু হচ্ছে, স্বীয় শক্তি সামর্থের তোয়াক্কা করে নয়, তখন তা আপনার অন্তরের উপস্থিতি ও যাবতীয় কল্যাণ লাভের পথে সমূহ প্রতিবন্ধক দূরীকরণে প্রধান সহায়ক হয়ে থাকবে।

﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾

অর্থ: "পরম করুণাময় অতি দয়ালু।"

রহমত থেকে উদ্ভুত গুণবাচক দুটো নাম। তন্মধ্যে একটি অপরটি চেয়ে অধিকতর অর্থবহ। যেমন; সর্বজ্ঞ ও অতি জ্ঞানী। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন: এ গুণবাচক নাম দুটো অতি সূক্ষ্ম, তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম অর্থাৎ অধিক রহমত সম্পন্ন।

সূরা ফাতেহা

সূরা ফাতেহা সাতটি আয়াতের সমষ্টি। প্রথম তিন আয়াত ও চতুর্থ আয়াতের প্রথমার্ধ আল্লাহর জন্য এবং চতুর্থ আয়াতের দ্বিতীয়ার্ধ সহ শেষ তিন আয়াত বান্দার জন্য। সূরার প্রথম আয়াত:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

অর্থ: "সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক।"

জেনে রাখুন, اَلْحَمْدُ এর অর্থ ঐচ্ছিক উপকার সাধনের উপর মৌখিক প্রশংসা ব্যক্ত করা। মৌখিক প্রশংসা বলে কাজের মাধ্যমে যে প্রশংসা হয় তা পৃথক করে দেওয়া হল। কাজের মাধ্যমে প্রশংসা যাকে লিসানুল হাল বা অবস্থার ভাষা বলা হয়, মূলতঃ তা কৃতজ্ঞতারই এক প্রকার। ঐচ্ছিক উপকার বলে এমন কাজই বুঝানো হয়েছে যা মানুষ আপন ইচ্ছায় করে থাকে। আর, যে উপকার বা উত্তম কাজে মানুষের কোন হাত নেই যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি, এমন বিষয়ের উপর প্রশংসা করাকে হাম্‌দ না বলে মাদ্‌হ বলা হয়ে থাকে। হাম্‌দ এবং শুক্‌র এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো: হামদের মধ্যে গুণাবলী বর্ণনাসহ প্রশংসিত জনের মাদ্‌হ ও প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা প্রশংসাকারীর প্রতি কোন এহ্‌সানের বিনিময়ে সাধিত হোক অথবা বিনিময় ছাড়া হোক। আর, শুকর কেবল কৃতজ্ঞের প্রতি এহ্‌সানের বিনিময়েই হয়ে থাকে। এ দিক দিয়ে শুকরের চেয়ে হাম্‌দ ব্যাপক। কেননা, হাম্‌দ এর মধ্যে গুণাবলী ও এহসান উভয়ই অন্ত র্ভুক্ত।

তাই, আল্লাহ পাকের হাম্‌দ করা হয় তাঁর সর্বসুন্দর নাম সমূহ এবং পূর্বাপর তাঁর সমূহ সৃষ্টির উপর। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ (١١١) سورة الإسراء

অর্থ: "আল্লাহ তা'য়ালারই সকল প্রশংসা যিনি তাঁর কোন সন্তান বানাননি।" [সূরা ইসরা: ১১১] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ (١) سورة الأنعام

অর্থ: "আল্লাহ তা'য়ালারই সকল প্রশংসা যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল-আন'আম: ১] এই প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

শুকর কেবল দান বা অনুগ্রহের বিনিময়েই হয়ে থাকে। তাই, এদিক দিয়ে এর প্রয়োগ উক্ত হামদের চেয়ে সীমিত। তবে, তার প্রয়োগ অন্তর, হাত ও ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন:

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ (١٣) سورة سبأ

অর্থ: "হে দাউদ বংশধরগণ! কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমরা নেক কাজ করে যাও।" [সূরা সাবা: ১৩] পক্ষান্তরে হাম্‌দ কেবল অন্তর এবং ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হয়। এই দিক দিয়ে শুক্‌র তার বিভিন্ন প্রকার অনুসারে অধিকতর ব্যাপক এবং হাম্‌দ তার উপলক্ষের দিক দিয়ে অধিকতর ব্যাপক।

الْحَمْدُ এর আলিফ ও লাম সার্বিক বা বর্গীয় অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সর্ববিধ প্রশংসা এর অন্তর্গত এবং সবই আল্লাহ পাকের

জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। এমন সব কাজ যাতে মানুষের কোন হাত নেই যেমন মানুষ সৃষ্টি, চক্ষু, অন্তর ইত্যাদি সৃষ্টি, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং জীবিকারাজি প্রদান ইত্যাদি, এই জাতীয় কাজের উপর আল্লাহর প্রশংসা স্পষ্ট। আর, যে সব কাজের উপর মখলুক প্রশংসা কুড়ায়, যেমন; নেক বান্দাহ ও নাবী-রাসূলগণ যে সব কাজের জন্য প্রশংসিত হন, এই ভাবে কেউ কোন মঙ্গল কাজ করলে, বিশেষ করে তা যদি আপনার উদ্দেশ্যে করে থাকে, এই সমস্ত প্রশংসাও আল্লাহ পাকের প্রাপ্য। তা এই অর্থে যে, আল্লাহ পাকই এই কর্তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে এই কাজ করার উপকরণ প্রদান করেছেন এবং তাকে এই কাজের উপর আগ্রহী ও সামর্থ্য করেছেন। এ ছাড়া আরো অনেক অনুগ্রহ দান করেছেন যার কোন একটার অবর্তমানে এই কর্তা ব্যক্তি প্রশংসিত হতে পারে না। এই দৃষ্টিতেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

﴿لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ: "আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক।" 'আল্লাহ' আমাদের মহান ও কল্যাণময় প্রতিপালকের নাম। এর অর্থ: ইলাহ অর্থাৎ মা'বূদ (উপাস্য)। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَهُوَاللهُ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣) سورة الأنعام

অর্থ: "এবং তিনিই আল্লাহ আকাশ মন্ডলীতে ও পৃথিবীতে।" [সূরা আল-আন'আম: ৩] অর্থাৎ তিনি মা'বূদ আকাশ মন্ডলীতে এবং মা'বূদ এই পৃথিবীতে। তিনি অন্যত্রে বলেন:

﴿إن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (٩٣-٩٥) سورة مريم

অর্থ: "আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তাদেরকে বিশেষ ভাবে গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তারা সবাই আল্লাহর সমীপে একাকী অবস্থায় উপস্থিত হবে।" [সূরা মারয়াম: ৯৩-৯৫]

رَبٌّ এর অর্থ প্রভু, প্রতিপালক, নিয়ন্তা। الْعَالَمِيْنَ একবচনে الْعَالَم মহান কল্যাণময় আল্লাহ বাদে সবকিছুকে আলম নামে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ বাদে প্রত্যেক বাদশাহ, নাবী, মানুষ, জিন, ইত্যাদি প্রতিপালিত, বশবর্তী, নিয়ন্ত্রিত, ফকীর ও মুখাপেক্ষী। সবই এক মহান সত্তার প্রতি সম্পর্কিত, এতে তার কোন শরীক নেই। তিনিই পর মুখাপেক্ষী বিহীন সত্তা এবং তাঁরই প্রতি সর্ব বিষয় সম্পর্কিত।[1]

এরপর আল্লাহ পাক উল্লেখ করেন: مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অন্য এক ক্বিরাতে আছে: مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْن এখানে দ্রষ্টব্য যে, আল্লাহ পাক কুরআনের প্রথম সূরার একই স্থানে যেভাবে উলুহিয়াহ, রুবুবিয়াহ ও মুলকের বা আধিপত্যের উল্লেখ করেছেন সেভাবে কুরআনের শেষ সূরায় এগুলোর উল্লেখ করে তিনি বলেন:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاس إِلَهِ النَّاسِ﴾

---

[1] الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ এর অর্থ বিসমিল্লাহর ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

অর্থ: “বল (হে রাসূল) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা‘বূদের।”

মহান কল্যাণময় আল্লাহ কুরআনের প্রথম দিকে এক স্থানে তাঁর এই তিনটি গুণের উল্লেখ করেছেন, আবার এই গুণত্রয় কুরআনের শেষাংশে এক স্থানে একত্রে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চায় তার উচিত এই স্থানদ্বয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা এবং এই সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনায় সচেষ্ট হওয়া। তার আরো জানা উচিত যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক কুরআনের প্রথমে, আবার কুরআনের শেষাংশে একত্রে এগুলোর উল্লেখ একসাথে করেছেন। কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, এগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করা। এবং এগুলোর পরস্পরের মধ্যে অর্থগত ব্যবধান সম্পর্কে বান্দার অবগত হওয়া অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি গুণের একটা নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যা অন্যটির মধ্যে নেই। যেমন, মুহাম্মদ ﷺ এর তিনটি গুণ, আল্লাহর রাসূল, সর্বশেষ নাবী এবং আদম সন্তান। মোটকথা, এর প্রত্যেকটির এক একটি অর্থ রয়েছে যা অন্যটি থেকে ভিন্ন।

যখন এ কথা জানা হলো যে, আল্লাহর অর্থ ইলাহ এবং ইলাহ যিনি তিনিই মা‘বূদ। অতঃপর তুমি তাকে ডাকো, তার নামে কুরবানী করো বা তাঁর নামে মানত কর তখন সত্যিকার ভাবে তুমি বিশ্বাস করলে যে তিনিই আল্লাহ। আর যদি কোন সৃষ্টিকে ডাকো ভালো হউক আর মন্দ হউক বা তাঁর নামে কুরবানী বা তাঁর নামে মানত কর তাহলে তোমার বিশ্বাস হলো যে এটাই তোমার আল্লাহ। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তার জীবনের ক্ষণিকের জন্য হলেও ‘শামসান’[1] অথবা ‘তাজ’[1] কে

---

[1]শামসান: প্রকৃত নাম মুহাম্মদ বিন শামসান। তার ছেলেরা তার নামে মানত করার জন্য লোকদের নির্দেশ দিত। লোক তাকে বিশেষ ওলী ও শাফা'আতের অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করত।

আল্লাহ হিসেবে বিশ্বাস করেছে তাহলে সে বানী ইসরাঈলদের পর্যায়ে পতিত হবে যখন তারা গো বাছুর উপাসনা করেছিল। অতঃপর যখন তাদের কাছে তাদের ভ্রান্তি ধরা পড়লো তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও অনুতপ্ত হয়ে যা বলেছিল তা আল্লাহ পাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١٤٩) سورة الأعراف

অর্থ: "অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার ক্ষমা ও করুণা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস (সর্বনাশগ্রস্ত) হয়ে যাব।" [সূরা আ'রাফ: ১৪৯]

رَبِّ এর অর্থ হল মালিক, নিয়ন্তা। আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুর মালিক এবং তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, এটি ধ্রুব সত্য। প্রতিমা পুজকরা যাদের বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ যুদ্ধ করেছেন তারা আল্লাহর এই গুণ স্বীকার করত। আল্লাহ পাক এই সম্পর্কে কুরআন শরীফের একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন, যেমন সূরা ইউনুসের এক আয়াতে বলেন:

---

[1]তাজ: রিয়াদের অদূরে 'আল-খারজ' এলাকার অধিবাসী ছিল। লোক তাকে বিশেষ ওলী ও অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। তার নামে মানব জমা করা হত। শাসক বৃন্দ তাকে ও তার অনুসারীদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। তাজ ও শামসানের দ্বারা নাজ্‌দ এলাকায় অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়েছিল।

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَـــارَ وَمَـــن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾ (٣١) سورة يونس

অর্থ: "(হে রাসূল) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আকাশ থেকে ও পৃথিবী থেকে? কিংবা কে তোমাদের কান বা চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে কে-ইবা মৃতকে জীবিতদের মধ্য থেকে বের করে? কে করে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন তুমি বল, তারপরও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না।" [সূরা ইউনুস: ৩১]

সুতরাং যে ব্যক্তি বিপদ মুক্তি ও প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে ডাকে এবং পরে এই উদ্দেশ্যে কোন মখলুককেও ডাকে, বিশেষ করে মখলুককে ডাকার সাথে তার এবাদতের সাথে নিজের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট করে ফেলে যেমন সে ডাকার সময় বলে, অমুক তোমার বান্দাহ বা অলীর বান্দাহ বা নাবীর বান্দাহ অথবা যুবাইরের বান্দাহ। তখন এর দ্বারা সে মখলুকের রুবুবিয়াত স্বীকার করে নিল এবং সমগ্র বিশ্বের রব্ব হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করল না বরং তার রুবুবিয়াতের কিছু অংশ অস্বীকার করে বসলো।

আল্লাহ পাক সে বান্দাকে রহম করুন যে নিজেকে নছীহত করে এবং এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবনের চেষ্টা করে, আর এই সম্পর্কে ছিরাতে মুস্তাকীমের অনুসারী আলেমগণের ভাষ্য জিজ্ঞেস করে। তারা সূরাটির ব্যাখ্যা এই ভাবে করেছেন কি না?

الْمَلِك শব্দের ব্যাখ্যা একটু পরে আসছে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ্ পাকের বাণী:

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

অর্থ: "প্রতিফল দিবসের মালিক।" অন্য ক্বিরাতে:

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

অর্থ: "প্রতিফল দিবসের অধিপতি।" উভয় আকারে সকল ভাষ্যকারদের নিকট এর অর্থ তাই যা আল্লাহ পাক তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে ব্যক্ত করেছেন। তা হল:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ (١٧-١٩) سورة الإنفطار

অর্থ: "আর, তুমি কর্মফল দিবস সম্পর্কে কি জান? আবার, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কি জান? সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না। সেদিন ক্ষমতা থাকবে শুধু আল্লাহর হাতে।" [সূরা ইনফেতার: ১৭-১৯]

যে ব্যক্তি এই আয়াতের ব্যাখ্যা সঠিক ভাবে অনুধাবন করবে এবং জানতে পারবে যে, কর্মফল দিবস ও অন্যান্য দিবস সহ সব কিছুর মালিক আল্লাহ পাক হওয়া সত্বেও এই দিনের (কিয়ামতের) অধিকারকে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সে উপলব্ধি করতে পারবে যে এখানে সেই মহান বিষয়টিকেই খাছ করে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা অনুধাবন করে যে বেহেস্ত যাওয়ার সে বেহেস্তে যাবে এবং যা পরিজ্ঞাত না হয়ে যে দোযখে যাওয়ার

সে দোযখে যাবে। বিষয়টি অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণ অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ পাকের' এই অর্থ কতই না মহান যার উপর বিশ বছর ধরে চিন্তা-ভাবনা করলেও এর যথাযথ হক আদায় সম্ভব হবে না। কোথায় সে মর্মার্থ ও এর প্রতি বিশ্বাস এবং কুরআন কর্তৃক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত বিষয়ের উপর ঈমান, আর কোথায় এই সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর বাণী: ((হে মুহাম্মদ ﷺ এর কন্যা ফাতেমা! আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে একটুও বাঁচাতে পারব না।)) কোথায় আল্লাহ্ ও তার রাসূলের এই কথা, আর কোথায় সে বোরদা কবি বোছাইরির উক্তি:

'হে রাসূলুল্লাহ! তোমার মর্যাদা আমার জন্য সংকোচিত হবে না যখন আল্লাহ্ করীম আমার উপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবেন। মুহাম্মদ নামকরণে আমার প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তাঁর উপর। আর তিনিই হলেন সর্বাধিক দায়িত্ব পূরণকারী। দয়া করে যদি তিনি হাতে ধরে আমায় উদ্ধার না করেন তাহলে আমার পদস্খলন নিশ্চিত।'

নিজের মঙ্গল কামনাকারীর পক্ষে উপরোক্ত কবিতা গুচ্ছ ও তার অর্থ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যে সকল সাধারণ মানুষ ও তথাকথিত আলেমবর্গ যারা এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট এবং কুরআন শরীফের পরিবর্তে এগুলোর যারা আবৃত্তি করে তাদেরও এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিত। কোন বান্দার অন্তরে কি এই কবিতা গুচ্ছের প্রতি বিশ্বাস আর আল্লাহ্ পাকের বাণী:

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ (١٩) سورة الإنفطار

অর্থ: “যেদিন কেউ কারো উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।” [সূরা আল-ইনফেতার: ১৯] এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীছ: ((হে মুহাম্মদ ﷺ এর কন্যা ফাতেমা! আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে একটুও বাঁচাতে পারব না।)) এর প্রতি বিশ্বাস একত্রিত হতে পারে? আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না, যেমন একত্রিত হতে পারে না এ কথা; মূসা আলাইহিস সালামের কথা সত্য এবং ফির'আউনেরও কথা সত্য, মুহাম্মদ ﷺ এর কথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আবু জাহ্‌লও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবিতা:

'আল্লাহর শপথ, বিষয় দুটু সমান নয়। তা একত্রিত হতে পারে না যতক্ষণ না কাকের মাথা শুভ্র বর্ণের হবে।'

সুতরাং যে ব্যক্তি এই বিষয়টি অনুধাবন করবে এবং বুরদার কবিতা ও এর আসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করবে সে ভাল করেই ইসলামের অসহায়তা উপলব্ধি করতে পারবে। এটাও উপলব্ধি করতে পারবে যে, শত্রুতা এবং আমাদের জান-মাল ও নারীদের হালাল মনে করা প্রকৃত পক্ষে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কাফের বলা বা তাদের সাথে যুদ্ধ করার কারণে নয় বরং তারাই (বিরোধীরা) আমাদের উপর যুদ্ধ ও কুফরী ফতওয়া শুরু করেছে। শুরু করেছে তখনই যখন আল্লাহ পাকের নিম্ন বাণী তুলে ধরা হলো। আল্লাহ পাক বলেন:

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١٨) سورة الجن

অর্থ: “সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।” [সূরা আল-জিন: ১৮] আল্লাহ পাক আরো বলেন:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ (٥٧) سورة الإسراء

অর্থ: “তারা যাদের আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতম হতে পারে।” [সূরা আল-ইসরা: ৫৭] তিনি আরো বলেন:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ﴾ (١٤) سورة الرعد

অর্থ: “সত্যের আহ্বান তাঁরই, যারা তাঁকে ব্যতীত অপরকে আহ্বান করে তাদের কোনই সাড়া দেয় না ওরা।” [সূরা আর-রা'দ: ১৪]

এই হল সকল মুফাস্সিরগণের ঐক্যমতে আল্লহর বাণী مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর মর্মার্থের কিয়দাংশ। আল্লাহ পাক স্বয়ং এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সূরা ইনফেতারের কয়েকটি আয়াতে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! (আল্লাহ আপনাকে তার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন) জেনে রাখুন, সর্বদা অসত্যের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। আরবীতে বলা হয়: وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ অর্থাৎ সকল বস্তু তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রিয় পাঠক! উপরে যা বলা হল সে বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর

চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, নিশ্চয়ই আপনি সঠিক ভাবে জানতে পারবেন, আপনার প্রপিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাত ও মুহাম্মদ ﷺ এর ধর্ম। ফলে, সেই পথে চলে তাদের উভয়ের সাথে কিয়ামতের দিন একত্রিত হবেন এবং এই পৃথিবীতে সত্য পথ থেকে দূরে থাকার কারণে কর্মফল দিবসে হাওযে কাওসার থেকে বিদূরিত হবেন না, যেমন বিদূরিত হবে সেই ব্যক্তি যে তাদের পথে লোকদের বাধা প্রদান করেছিল। আশা করি, আপনি কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর দিয়ে নিরাপদে পার হবেন। আপনার পদস্খলন ঘটবে না, যেমন ঘটবে ঐ ব্যক্তির পৃথিবীতে তাদের (ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ) ছিরাতে মুস্তাকীম থেকে যার পদস্খলন ঘটে থাকবে। সুতরাং আপনার কর্তব্য সর্বদা ভয় ও উপস্থিত চিত্তে এই ফাতেহার দু'আ পাঠ করা।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

অর্থ: "(হে আল্লাহ পাক!) আমরা শুধু তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য কামনা করি।"

এবাদতের অর্থ পূর্ণ মহব্বত, চরম বিনয়, ভয় ও অবচয়ন। এখানে কর্মকে ক্রিয়ার পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ক্রিয়ার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান এবং ক্রিয়াকে কর্মের মধ্যে সীমিত রাখা। অর্থাৎ অন্য কারো নয় কেবল তোমারই এবাদত করি এবং কেবল তোমার উপরই ভরসা করি। এটাই হলো চরম আনুগত্য। ধর্মের সব কিছুই এ দুটো অর্থের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম অর্থে শিরক থেকে এবং দ্বিতীয় অর্থে স্বীয় শক্তি সামর্থ্য থেকে বিমুক্তি কামনা করা হচ্ছে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ এবাদতে কেবল তোমারই তওহীদ প্রতিষ্ঠা করি। এর অর্থ: আপনি আপনার প্রভু প্রতিপালকের সাথে ওয়াদা ও চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, আপনি তাঁর সাথে তাঁর এবাদতে কাউকে শরীক করবেন না, হোক না সে স্বর্গীয় ফেরেশতা বা নাবী বা অন্য কেউ। যেমন, সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

﴿وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ (٨٠) سورة آل عمران

অর্থ: "এবং সে তোমাদের নির্দেশ দেয় না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নাবীগণকে নিজেদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে নাও তোমরা মুসলমান হবার পর সে কি তোমাদের কুফরী শিখাবে?" [সূরা আলে ইমরান: ৮০]

আয়াতটি অনুধাবন করুন এবং স্মরণ করুন, পূর্বে রুবুবিয়াত সম্পর্কে আলোচনায় যা বলেছিলাম। তাজ ও শামসানের প্রতি আরোপিত কু-বিশ্বাস ও কুসংস্কার জাতীয় কাজ যদি সাহাবাগণ রাসূলগণের সাথে করলে মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়ে যেত তাহলে যে লোক ঐরূপ কাজ তাজ বা তার অনুরূপ লোকের সাথে করে সে কি হতে পারে?

﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

অর্থ: "এবং আমরা শুধু তোমারই সাহায্য কামনা করি।"

إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে দুটো বিষয় রয়েছে, প্রথম বিষয়- আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং তা হলো তওয়াক্কুল করা এবং স্বীয় শক্তি সামর্থ্য থেকে বিমুক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো- বাস্তবে

আল্লাহর নিকট থেকে সাহায্য লাভের তলব পেশ করা। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সাহায্য প্রার্থনা বান্দার ভাগে পড়ে।

﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ﴾

অর্থ: "(হে আল্লাহ!) আমাদের সরল-সহজ পথে চালাও।"

এটাই হল, আল্লাহর নিকট বান্দার স্পষ্ট দু'আ, যা বান্দার ভাগে রয়েছে। এর অর্থ বিনয়, নম্র, অবিচল হয়ে আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন প্রার্থনাকারীকে এই মহান মতলব (ছিরাতে মুস্তাকীম) দান করেন। এটা এমন মতলব, দুনিয়া ও আখেরাতে এর চেয়ে উত্তম কিছু আল্লাহ কাউকে দান করেননি। আল্লাহ পাক মক্কা বিজয়ের পর তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এর উপর অনুগ্রহের উল্লেখ করে বলেন:

﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ (٢) سورة الفتح

অর্থ: "(যাতে তোমার) প্রভু তোমাকে ছিরাতে মুস্তকীমের পথে পরিচালিত করেন।" [সূরা আল-ফাত্হ: ২] এখানে الْهِدَايَة বলতে তওফীক ও পথ প্রদর্শন বুঝানো হয়েছে।

বান্দার পক্ষে উচিত উপরোক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা ছিরাতে মুস্তাকীমের প্রতি হেদায়াতের মধ্যে ফলপ্রসূ জ্ঞান ও নেক আমল অন্তর্ভুক্ত যাতে বান্দাহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত এর উপর সঠিক ভাবে পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

الصِّرَاط এর অর্থ স্পষ্ট পথ। আর الْمُسْتَقِيْم এর অর্থ এমন পথ যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। ছিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা সেই ধর্ম বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের উপর নাযেল

করেছেন এবং এটাই তাদের পথ যাদের উপর আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। আর, তাঁরা হলেন রাসূল ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণ।[1]

প্রিয় পাঠক! আপনি সর্বদা প্রতি রাক'আতে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন, তিনি যেন আপনাকে নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে পরিচালিত করেন। আপনার উপর আল্লাহ পাকের এ কথা সত্য বলে স্বীকার করা যে, এ পথই হল ছিরাতে মুস্তাকীম। তাই, যখনই কোন পদ্ধতি, জ্ঞান বা এবাদত এই পথের পরিপন্থী হবে তা ছিরাতে মুস্তাকীম হতে পারে না। বরং তা হবে বক্র ও বিভ্রান্ত। এটাই হল উক্ত আয়াতের দাবী এবং একে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেই হবে। প্রত্যেক মু'মিনকে অবশ্যই শয়তানের এই প্রবঞ্চনা ও ধোকা যে উপরোক্ত বিষয়ে মোটামুটি ভাবে বিশ্বাস রেখে বিস্তারিত ভাবে পরিত্যাগ করা চলে, এই বিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা অধিকাংশ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) এই বিশ্বাস পোষণ করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা তার বিরোধী হবে তা বাতেল। এরপর যখন তিনি এমন কিছু

---

[1] أنعمت عليهم

="তুমি যাদের উপর নেয়ামত দান করেছ" এর ব্যাখ্যায় এখানে তাফসীর ইবনে কাছীরে বর্ণিত আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামের তাফসীর অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ইবনে কাছীরসহ অধিকাংশ মুফাসসিরগণ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ এর তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা আয়াতের ব্যাখ্যায় এই আয়াত পেশ করেন:

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (٦٩) سورة النساء

অর্থ: "আর যে আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে ঐসব লোকের সাথী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হলেন, নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল নেক বান্দাগণ। আর, তাঁদের সান্নিধ্য কতই উত্তম। [সূরা আন-নিসা: ৬৯] অনুবাদক

নিয়ে আসেন যা তাদের প্রবৃত্তি চায় না তখন তারা ওদের মত হয়ে যায় যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন:

﴿فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ (٧٠) سورة المائدة

অর্থ: "তখন তারা এক দলকে অবিশ্বাস করে এবং এক দলকে তারা হত্যা করে।" [সূরা আল-মায়েদা: ৭০]

﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾

অর্থ: "তাদের পথে নয় যাদের উপর তোমার গযব পড়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

যাদের উপর গযব পড়েছে তারা হল ঐসব ওলামা যারা তাদের ইলম মোতাবেক আমল করে নাই। এবং الضالون **'পথভ্রষ্ট'** ওরাই যারা ইলম ব্যতিরেকে আমল করে। প্রথমটা হল ইয়াহুদীদের গুণ আর দ্বিতীয়টা হল খৃষ্টানদের গুণ।

অনেক লোকের অবস্থা এই যে, তারা যখন তাফসীরে দেখে ইয়াহুদীরা গযবপ্রাপ্ত, আর খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট, তখন সেই জাহেল লোকদের ধারনা হয় যে, উপরোক্ত গুণাবলী ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং এ কথাও তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন যেন তারা এই দু'আ করে এবং উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

সুবহানাল্লাহ! কিভাবে সে ধারণা করে যে, তাকে আল্লাহ পাক এই শিক্ষা দিলেন এবং তার জন্য পছন্দ করে তার উপর ফরয করে দিলেন যেন সে সর্বদা এই দু'আ করে, অথচ, তার উপর এ কাজের কোন ভয় নেই। এমনকি, সে চিন্তাও করে না যে,

সে এমন কাজ করতে পারে। এটা আল্লাহর উপর তার কু-ধারণার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

(সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা এখানেই শেষ)

উল্লেখযোগ্য যে, আমীন শব্দটি সূরা ফাতেহার অংশ নয়। এটা দু'আর উপর সমর্থন সূচক শব্দ। এর অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর।' জাহেল লোকদের এই বিষয়টি জানিয়ে দেয়া কর্তব্য, যাতে তারা এ ধারণা পোষণ না করে যে, এ শব্দটি আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পরিশেষে, দরূদ ও সালাম জানাই আমাদের প্রিয় নাবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি।

সমাপ্ত